Chhobighar

Gargi Bhattacharya

******

COPYRIGHTED
MATERIAL

ছবিঘর

গার্গী ভট্টাচার্য

গোলবার্ণ ভ্যালির নি:স্তব্ধতাকে

ছবিঘর

রেবেকা

ক্যানবেরা পাহাড়ি জায়গা । চারপাশে বড় বড় পাহাড় । মাঝে এই রাজধানী । এই শহরের এক পাহাড়ে , একটি ক্ষুদ্র বৃদ্ধাবাসে আছেন এক নারী । তার নাম সুলক্ষণা । অনেক বয়স হয়েছে তার । পুত্র কন্যা নিজ নিজ জীবনে প্রতিষ্ঠিত । অনেক দূরে থাকে তারা । স্বামী মারা যাবার পরে সুলক্ষণা আর বিদেশীদের মতন অন্য সঙ্গী খুঁজে নেয়নি । একাই থেকেছে । পরে স্বাস্থ্য ভেঙে পড়াতে এই বৃদ্ধাবাসে এসে বসবাস শুরু করেছে । এই জায়গাটির নাম কেমন যেন ভারতের নামের মতন । লাবণী । লাবণীতে নিজ দুই কামরার ঘরে থাকে সুলক্ষণা । ঝুঁকে হাঁটে । কোমড় ভেঙেছে ।

খাবার আসে বাইরে থেকে । পুষ্টিকর খাদ্য । সপ্তাহে একদিন চিকিৎসক আসে । আসে জল ও ইলেকট্রিক বিলের লোক । আর আসে রেবেকা ! রেবেকা এক মেম মেয়ে । অনেক দূরে ওদের ফার্ম হাউজ ।

সেখানে ও নিজের বাবা ও মায়ের সাথে থাকে । বাবা ও মা ফার্মিং করে আর রেবেকা মধুবনী পেন্টিং শিখে এসেছে ভারত থেকে তাই এখন মিউজিয়ামের কাজ করে-- আর অর্ডার নিয়ে লোকের জন্য এই আর্ট আঁকে ।

রেবেকার পিসিমা এই লাবণীতে আছে । সেখানেই আলাপ সুলক্ষণার সাথে । পিসিমা আদতে সুলক্ষণার এক ভালো মিত্র ।

প্রতিদিন বিকেলে আসে মেয়েটি । ও কিন্তু খুবই ব্যস্ত ! আর্টের কাজ , মিউজিয়ামে আর্ট বিভাগে কাজ করে তাই । তবুও আসে আর আশ্চর্য হল সাইকেল নিয়ে আসে । সব জায়গায় সাইকেল নিয়ে যায় ।

বলে :যেখানে সাইকেল যায়না সেখানে আমিও যাইনা ।

এখানে তো লোকে বিল্ডিং এর মধ্যেও সাইকেল চালায় । লিফট্-এ নিয়ে ; উঠে যায় উঁচুতলায় ।

কাজেই অসুবিধে নেই ।

সন্ধ্যাবেলায় অবশ্য একটু ভয়ের ব্যাপার থাকে । বনপথে , সাইকেল নিয়ে গেলে কিছু উটকো পশুর কবলে পড়তে পারে । তবুও রেবেকা রোজ আসে ।

মধুবনী পেন্টিং করে করে ও এখন ওস্তাদ হয়ে গেছে ।

ভারতে গিয়ে শিখে এসেছে এই কলা । ওখানে নাকি এক গ্রামে- চওড়া পথ করার জন্য গাছ কাটার কথা ছিলো । সেখানে আর্টিস্টরা , গাছের গায়ে মধুবনী চিত্র এঁকে এঁকে এত্তো সুন্দর করে দিয়েছিলো যে সেই গাছ আর কাটা পড়েনি ।

দেশের গল্প দিনশেষে শুনতে ভালই লাগে সুলক্ষণার !

তবুও রেবেকার সেফ্‌টির কথা ভেবে প্রতি সন্ধ্যায় ওকে এইভাবে ফিরে যেতে বারণ করে । রেবেকা শুনবে না ! কারণ যেই মধুবনী ওকে এত ভালোবাসা দিয়েছে সেই দেশের এক বৃদ্ধাকে একটু সঙ্গ না দিলে ওর মন ভালো থাকবে না । তাই একাকিনী সুলক্ষণার সঙ্গী রেবেকা । যতই ঝড়জল হোক্ না কেন রেবেকা এসে দরজায় নক্ করবেই !

সাইকেল একটু দূরে রেখে , পায়ে হেঁটে এসে পা ছুঁয়ে প্রণাম করবে , রোজ ।

এমনই মেয়ে সে । মধুবনী তো একেই বলে তাই না ?

বনের মধু আর কাকেই বা বলা যায় ??

তটিনী

বিয়ে ভেঙে গেছে তটিনীর । আসলে ওর বিশ্বাস ভেঙে গেছে । বিদেশে এসে বিয়ে করেছিলো শায়েরকে ।

শায়ের আমেরিকা থেকে এসেছে । ওর বাবা ও মা দুজনেই হিন্দু আর ভারতের মানুষ । বাবা কবিতা প্রেমী বলেই পুত্রের নাম শায়ের দিয়েছে । প্রবাসী বাঙালী মা ছিলো হিন্দী টিচার । তাই হিন্দি ও উর্দু ভাষায় পটিয়সী । পুত্রের নাম শায়ের আর কন্যার নাম শায়েরি দেওয়া হয় ।

হিন্দু , সেই বিশ্বাসেই তটিনী ওকে বিয়ে করে ।

কিন্তু বিয়ের পরে সমস্ত বিশ্বাস ভেঙে যায় । **কারণ শায়েরের পুরুষাঙ্গের উপরিভাগের চামড়াতে কাটাছেঁড়া করা ছিলো ।** ওকে মুসলিম বলে শনাক্ত করে তটিনী । মুসলিমদের তটিনী অপছন্দ করতো ।

শায়ের কিছুতেই ওকে বোঝাতে পারেনি যে ও আসলে হিন্দু কিন্তু একটি অসুখে ওকে অপারেশান করাতে হয়েছিলো বলেই ওর এমন দশা !

তটিনী ; ওর বাবা ও মাকে ফোন করে যেন জেনে নেয় সত্যটা !

কিন্তু তটিনী অসম্ভব জেদী মেয়ে । একবার যা ভাবে তা করেই ছাড়ে । কোনো লজিকের ধার ধারে না । তাই বলে যে এরকম এক প্যাথলজিক্যাল লায়ার মানে মিথ্যেবাদীর জন্ম যেই বাবা-মা দিয়েছে , তারাও ওরকমই হবে । কাজেই ফোন করার কোন মানেই হয়না ।

বিয়েও ভেঙে যায় । ভেঙে যায় বিশ্বাস ।

অবিশ্বাসের কারণে !!

উকিল

এক নারীকে দেখলে সব উকিলেরা ভয়ে পালায় । ভদ্রমহিলার নাম পান্তি পন্থ । অসুখে চোখ দুটি ঠেলে বেরিয়ে এসেছে । চ্যালাকাঠের মতন চেহারা তার আর অসম্ভব কথা বলে । চ্যাটারবক্স ।

মহিলা , একটু উল্টোপাল্টা কিছু দেখলেই লোককে কেসে ফাঁসিয়ে দেয় । ওর কাজ হল লোকের বিরুদ্ধে কেস করা । আজকাল উকিলও ওকে দেখে ভয়ে পালায় ।

এক চিকিৎসককে কেসে ফাঁসায় , কারণ সেই ডাক্তার এন্ডোস্কোপ করেছে কিন্তু শ্বাসনালির ব্যাধি ধরতে পারেনি । সে যতই বলে যে সে খাদ্যনালি দিয়ে ঢুকেছে , পান্তি পন্থ শোনার বান্দা নয় । তার বক্তব্য যে চোখ বন্ধ করে গেলে এমনই হবে । রাস্তার পাশে কী হচ্ছে দেখবে না চিকিৎসক ?

টমকে কেসে ফাঁসায় কারণ পান্তির স্বামী ওকে চিট্ করেছে ,আর টম ওদের আলাপ করিয়েছিলো অনেক বছর আগে । অর্থাৎ টম কেন জানতো না যে লোকটি মানে পান্তি পন্থের স্বামী এরকম চরিত্রহীন !

ঢিল মেরে মহিলা ; লোকের বাড়ির কাঁচ ভাঙে । তখন কেউ কিছু বলতে পারবে না কারণ ওর স্ট্রেস হয়েছে বলেই এরকম করেছে ।

পান্তি পন্থের বিরুদ্ধে কেউ কেস ঠুকতে পারবে না এমনই যুক্তির বেড়াজালে নিজেকে আটকে রেখেছে মহিলা ।

তাই আজকাল দুঁদে উকিলেরাও ওকে দেখলে লুকিয়ে পড়ে ।

কালা জাদু

আসামের, মায়ং গ্রাম নাকি কালা জাদুর জন্য বিখ্যাত । এখানে লোকেরা জাদুটোনা করে করে মানুষকে নাকি নিমেষেই পশুতে রূপান্তরিত করে । আজও এই প্রগতির যুগে- এই গ্রামে যেতে অনেকেই দ্বিধা বোধ করে ।

খবর পেয়ে , দিল্লী থেকে সুরঞ্জন আর কোকিলা পারেখ দ্রুত সেই গ্রামে যায় । মজা দেখতে গেলেও ওরা সেখানে গিয়ে এক কিশোরকে , দিল্লী শহর দেখাবে বলে সঙ্গে করে নিয়ে আসে ।

কিশোর ভোদু ;ভারতের রাজধানী দেখবে বলে ওদের সাথে চলেই আসে। কত নাম শুনেছে দিল্লীর ! না জানি কেমন শহর ! চওড়া চওড়া রাস্তা , নানান রকমের মানুষ দেখতে পাবে ভোদু ! তাই দিল্লী আসে । সেখানে নিউ ও ওল্ড দুই দিল্লী আছে জানতে পারে । এরই অল্প দূরেই বিখ্যাত তাজমহল । যমুনা নদী ।

সমস্ত ইতিহাসে পড়েছে মায়ানগরী মায়ং এর মায়াবী কিশোর ভোদু ।

মাসখানেক কেটে গেলেও মায়ং এ আর ফেরা হয়না ।

কারণ মায়া-জগৎ থেকে এলেও একপ্রকার কায়াহীন হয়েই দিন কাটায় ভোদু ; দিল্লী নগরে ।

যেখানে মানুষকে কালো জাদুর স্পর্শে পশু করে দেওয়া হয় সেখান থেকে সভ্য শহরে এসে ভোদু দেখে যে শহুরে, অত্যাধুনিক মানুষও সাদা জাদুবলে গ্রামীণ মানুষকে কেমন ক্রীতদাস করে দেয় !

শহরের এমনই হালচাল । পশু হলে কষ্ট কম কারণ ওদের অনেক কিছুই মানুষের থেকে কম আছে বলে ভোগের সংজ্ঞাও অন্য । আর মান ও হুঁষের জীবগুলি , ক্রীতদাস হয়ে ভোগে বেশি । কারণ দাসত্বের শৃঙ্খল , পশুর বন্য জীবনের চেয়ে অনেক বেশি কষ্টের ।

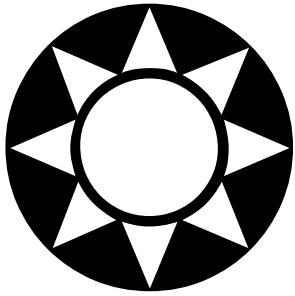

ডি এন এ

_শিশুটির জন্ম হয়েছে অনেকদিন হল কিন্তু বাড়িতে আসা হয়নি । বাবা ও মা রয়েছে শিশুটির সাথে আর তারা ওর আইনতঃ পিতামাতা ।

পরিবারের আরো অনেক মানুষ রয়েছে ।

মায়ের দিকে আর বাবার দিকেও !

ওদের পরিবারের অভ্যাস হল এই যে কোনো সন্তান এলে ওরা সবাই মিলে, ড্রাম বাজিয়ে ও গান করতে করতে হাসপাতালে চলে যায় আর নতুন শিশুটিকে

নিয়ে আনন্দ ফুর্তি করে । এবারেও সেরকমই হয়েছে কিন্তু ওকে নিজেদের বাসায় নিয়ে যাওয়া যাচ্ছেনা । কারণ সরকার নতুন নিয়ম চালু করেছে যে **ডিএনএ** পরীক্ষা করে তবেই বাড়ি নিয়ে যাওয়া যাবে । হাসপাতাল থেকে শিশু গায়েব হয়ে যাচ্ছে এমন ব্যাপারও নয় । কিন্তু আইন করে ডিএনএ পরীক্ষার নিয়ম চালু করা হয়েছে যাতে ভূমিষ্ঠ হওয়া মানবসন্তান নিজ বাড়িতে , পরীক্ষিত মানে আসল পেরেন্টের সাথেই যায় ।

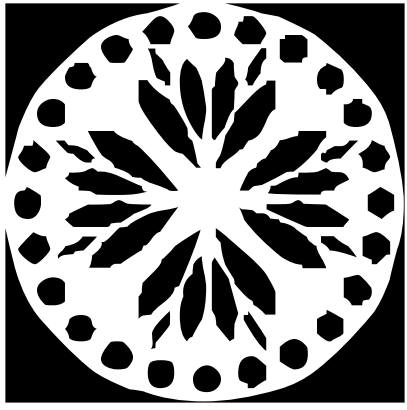

টিচার

মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে গাড়ি পরিস্কার করে ফ্রান্সিস্ । যখন সিগন্যালে অথবা জ্যামে দাঁড়ায় ঠিক তখনই সে আসে ; হাতে মোছার সরঞ্জাম নিয়ে ! কেউ ওকে কিছু পয়সা দেয় কেউ না দিয়েই চলে যায় ।

চিরটাকাল এমন দিন ছিলো না ওর ! আগে একটি ভালো স্কুলে টিচার ছিলো ফান্সিস্ । যদিও শহরের দক্ষিণ অঞ্চলে সেরকম ভালো স্কুল নেই , ধনী ও অবস্থাপন্ন মানুষ উত্তুরে স্কুলে তাদের বাচ্চাদের পাঠায় তবুও ফ্রান্সিসের স্কুল মন্দ ছিলো না ।

একদিন এক পথচারীর সাথে কিঞ্চিৎ কথা কাটাকাটি হয় এবং অবস্থা চরমে উঠলে হাতাহাতি ।

তারপরেই ওকে স্কুল থেকে তাড়ানো হয় ।

যেই শিক্ষক , জনসাধারণের মধ্যে গিয়ে দৈহিকভাবে কাউকে আক্রমণ করে সেই শিক্ষকের নীতিগতভাবে কোনো অধিকার নেই ছাত্র পড়ানোর ।

মোটা ফাইন দিতে গিয়ে ও সংসারের হাল ধরতে গিয়ে সর্বসান্ত হয় ফান্সিস্ ! কাজেই এখন পথপাশে বসে, চলমান যানবাহনের রূপচর্চায় ডুবে থাকে ।

ওর কাছেই জেনেছি যে জাপানী ও চীনামানুষ দেখতে আলাদা রকমের । সবার চোখ ও নাক একটু সরু ও বোঁচা টাইপের এরকম আমাদের মনে হলেও আসলে নাকি ওরা দেখতে আলাদা রকমের ।

এসবই সে পথপাশে বসে বসে দেখেছে ও শিখেছে ।

--আমাকে তোমরা রূপলাগি, ম্যান অন্ দা রোড , মাইরি যাই বলো ।

মাল

অন্ত্রে পচন ধরেছে অনেক মানুষের , ধরছে ঋষভ রাজের । তবুও অ্যাড কোম্পানির কাজ করতে গিয়ে

একটি বিশেষ ড্রিংকের অ্যাড বাদ পড়ছে না ।

মধুময় নাম ; এই রসায়নে পরিপূর্ণ জলীয় দ্রব্য যা মানুষকে রোগা ও সুন্দর করে ।

ঋষভ নিজেও এই পানীয় নিয়মিত খায় ।

আসলে ওর শুভাকাঙ্খীরা অনেকবার ওকে বারণ করতে গিয়ে যা উত্তর পেয়েছে তা হল : :

----অন্ত্রে পচন ধরলে তা অস্ত্রপচার করে সারানো যাবে ও বেঁচে থাকা সম্ভব হবে আধুনিক যুগে । কিন্তু মাল না পেলে, সাধারণ জীবনধারণও সম্ভব হবে না । অসহ্য হয়ে উঠবে জীবন যাপণ । আজকাল মাল না থাকলে মানুষ অসহায় ! একটা বাচ্চা, মানুষ করতে গেলেও অনেক টাকার প্রয়োজন । **কাজেই মাল আসছে কিনা সেটা বেশি ইম্পর্ট্যান্ট । অন্ত্র স্বাস্থ্যের চেয়ে ।**

জীবনের মালগাড়িতে চড়ে বসেছে সবাই । ইচ্ছা কিংবা অনিচ্ছাতে । কাজেই এখন ধীরগতিতে চলা এই যানবাহনে, নিজ মান রাখতে অনেক টাকা চাই । মোহরের সন্ধানে আছে মানুষ -অপমৃত্যুর ভয়ে ওরা ভীত নয় !!!

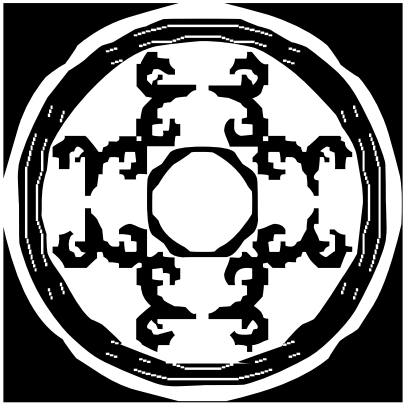

চিফ্ অফিসার

ম্যাকডোনাল্ডস্ রেস্তোরাঁতে সর্বপ্রথম হানিকে দেখি ।

মেয়েটির নাম হানি । হানি হোড় বিদেশেই জন্মেছে কিন্তু ওর ছাত্রী মা ওকে একা মানুষ করতে অক্ষম বলে অনাথ আশ্রমে দিয়ে এসেছে । আর পড়তে এসে সন্তান হয়েছে কাজেই তাকে নিয়ে বিবাদ হবে ভারতের সমাজে । ওর মা দেশে ফিরে গেছে । আবার নতুন করে সংসার করেছে । তাই হানি হোড় বেড়ে ওঠে আশ্রমে । মাথাটি ছোট , দেহের তুলনায় ।

সবসময় চুপ করে থাকে । কথা বলেনা । কথা বলতে পারেনা অত । দেখলেই বোঝা যায় যে ওর দৈহিক ও মানসিক সমস্যা আছে ।

একটি দোকানে কাজ করে । সাফ করে, খাবার সাজায় । একই মেঝে বার বার মোছে । একই খাবার বার বার সাজিয়ে রাখে প্লেটে । তুলে নিয়ে আবার রাখে ।

এটাই ওর অসুখ । হানি হোড় অবশ্য এখন থাকে এক চিফ্ অফিসারের সাথে । তাঁর স্ত্রী ওকে নিয়ে আসেন আশ্রম থেকে । অফিসার, জলের প্লান্টে কাজ করতেন । শহরের শেষে বিরাট খাদ । সেখানে বৃষ্টির জল ধরা হয় । সেই জল নিয়ে যাওয়া হয় প্লান্টে । সেখানে নানান ভাবে ওকে শুদ্ধ করে তোলা হয় ও পানীয়ের জন্য ব্যবহার করা হয় । সেই অফিসেই একেবারে সবার উঁচু আসনে বসেন- এই অফিসার । তাই চিফ্ অফিসার ।

একটা ফোন ও সইয়ের অনেক দাম !

অফিসারের পত্নী আজও নিজের টাকাপয়সা ও স্বামীর অর্থভান্ডার আলাদা করে রেখেছেন । যদি বিচ্ছেদ হয়ে যায় সেই ভয়ে ।

চিফ্ অফিসার তাই হানিকে দু:খ করে বলেন যে **আজ প্রায় ৩৭ বছর আমরা একসাথে আছি । আর কবে আলাদা হবো ? এদিকে তোমার মম্, এখনো ড্যাডের সাথে আমার তোমার চালিয়ে যাচ্ছে !**

হানি হোড় হেসে ওঠে । হয়ত বোঝে কী বলা হচ্ছে !

তবে হানি কিন্তু আর হোড় নেই ! অভাগিনীর একটি নামও কেউ দেয়নি । আজ চিফ্ অফিসার ওকে পদবী দিয়েছেন । **ও এখন হানি টাইসন ।**

চাষী

অফিসে, আদিবাসী মানুষ গুরাণকে সবাই একটু এড়িয়ে চলে । সেটা সে আদিবাসী বলে যতনা তার চেয়েও বেশি ওর বন্ধুত্বের কবলে পড়ে অনেকেই ভয়ে সিঁটিয়ে গেছে । সেই কারণে লোকে ওকে এড়িয়ে চলে ।

আসল ঘটনা হল এই যে , ইস্টারে ও খ্রীস্টমাসে সে তার বাপ্‌দাদার দুনিয়ায় অফিসের বন্ধুদের নিয়ে যায় । সুবিশাল ফার্ম ও সবুজ মানুষ দেখতে অনেকেই গেছে । ফিরেছে ভয় পেয়ে ।

গল্প হল এই যে ওর বাবা , কুমির চাষী । নিজেকে চাষী বলে পরিচয় দেয় বলে অনেকেই বোঝেনা । চাষবাস দেখতে অনেক শহুরে লোক ওদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে ফেলে ।

তারপর কুমিরের আড্ডায় গিয়ে ভয়ে সিঁটিয়ে থাকে ।

কুমিরগুলো ঘুরে বেড়ায় আশেপাশে ।

ওরা বলে যে কারো ক্ষতি করেনা কিন্তু পশুর মতিগতি জানে কে ?

ওরা কুমির দিয়ে ভোজও সারে । কাজেই অনেকেই বেশ ভালোরকম ক্ষেপে যায় ।

তবুও ভদ্রতার খাতিরে কিছু বলা চলে না ।

তাই ওর সাথে বন্ধুত্বই রাখেনা আর কেউ ।

বেচারি ইদানিং মনমরা হয়ে থাকে । কিছুতেই বুঝতে পারেনা যে এত যত্ন-আত্তি করা সত্ত্বেও কেন লোকে শহরে এসেই ওকে ত্যাগ করে সামাজিকভাবে ।

আজও এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে চলেছে গুরাণ ।

এখন দেখার বিষয় যে উত্তর কবে পায় আর কী উত্তর আসে !

বডি আর্ট

অনেক দোকানের মাঝখানে মুক্তার দোকান । মুক্তা পাইন । কলকাতার মেয়ে ।

ট্যাটু শিল্পে পারদর্শিনী । সারা গায়ে লোকে এমন ট্যাটু করছে যে মুক্তা এখন রীতিমতন মার্সিডিজ চড়ে ।

সমাজের সর্বস্তরের মানুষ আসছে ট্যাটু করতে ।

এইভাবেই আলাপ হয় টুটু দত্তবণিকের সাথে ।

টুটু খুব ভালো ছেলে । মুক্তার সাথে ডেট করেছে কিন্তু ওর ভার্জিনিটি রক্ষা করেছে । বলেছে : যতদিন চাও শুদ্ধ থাকো ।

তবে টুটুর বাবা ও মা এই বিয়েতে প্রচন্ড আপত্তি জানায় । কারণ ওদের মতে এই কেলে মেয়েকে বিয়ে করলে পরবর্ত্তী প্রজন্মের শিশুরা কেলে হবে ।

লিটার‍্যালি, কেলে শব্দটা ব্যবহৃত হয়েছে ।

মুক্তা, বুদ্ধিমতী মেয়ে । ও কেবল জানতে চায় যে মেয়ের রং পছন্দ হলে, বিয়েতে মত দেবে তো গুরুজনেরা ?

টুটুর মা, ও বাবারা এই বিষয়ে সহমত জানায় - তাহলে আপত্তি নেই ।

মুক্তার গায়ের রং ; মুক্তোর মতন নয় । ওর দাঁতের সারি মুক্তোর মতন । ওর গায়ের রং এখন বিবিধ । ও সারাদেহে রঙীন ট্যাটু করে গায়ের আসল রং ঢেকে ফেলেছে । ওকে এখন আর কেলে নয় রঙীন মেয়েছেলে বলবে ওর হবু আত্মীয়রা ! **যারা কালো এক মেয়েকে, কেলে বলে সম্বোধন করে তারা নিশ্চয় মেয়েছেলেই বলবে তাই না ? এত অবাক হবার কী আছে ?**

বিমলা

বিমলা ঘটক বিদেশে এসেছ স্বামীর সাথে । স্বামী গীতিন্দ্র একজন সফল মানুষ । সবাই ওকে চেনে ।জীবন আরম্ভ করে টেস্টিং অ্যান্ড ট্যাগিং দিয়ে । নানান বিল্ডিং এর ইলেক্ট্রিক যন্ত্রপাতি নিয়মিত টেস্ট করতে হয় যাতে বিপদ আপদ না ঘটে । সেইভাবে জীবন শুরু করে আজ নিজের কোম্পানি চালায় । তার চেয়েও বড় কথা মানুষটি খুব সেবা করে । তাকে কখনো বসে থাকতে দেখা যায়না । অবসরে কোনো না কোনো সেবা সংস্থায় হাজির হয়ে কাজে লেগে পড়ে ।

ওর স্ত্রী বিমলা ঘটক একজন রুগ্ন মহিলা । সারাদিন ঘরে বসে কাটায় । লোকে তাকে খুব একটা দেখেও নি । যদিও গীতিন্দ্রর চেয়ে তাকেই বেশি সুন্দর দেখতে ।

লম্বা নাক , বড় বড় চোখের বিমলা এখানেও শাড়ি পরে । হাতে চুড়ি ও সিঁদুর । একদম খাস ইন্ডিয়ান রমণী । লোকে মনে করে যে গীতিন্দ্র আরো এগোতে

পারতো কিন্তু বিমলার স্বাস্থ্যের কারণে সে যতটা হওয়া উচিৎ ছিলো ততটা করতে পারেনি ।

গীতিন্দ্র একবার পথে নামলে কোনো না কোনো সংস্থা সেদিন অনেক ডোনেশান পায় । ওরা ছড়া লিখে নিয়ে যায় পতাকায় , ডোনেশান বক্সে ।

অনেকে অভিনয় করে দেখায় যে কেন তারা অর্থ ভিক্ষা চাইছে । অনেক জায়গায় ছোট ছোট স্ক্রীন লাগিয়ে, সেখানে নানা ভিডিও দেখানো-- **যা ঐ কজের সাথে যুক্ত ।** কাজেই লোকে টাকা ঢেলে দেয় ।

গীতিন্দ্র মারা যেতে, বিমলা দেশে ফিরে যাবে এইরকম সবাই ভাবলো । কারণ সে অসূর্যম্পশ্যা । কেউ তাকে দেখেনা । সেও কোনো অনুষ্ঠানে দেখা দেয়না ।

সবাই জানে যে নিঃসন্তান বিমলা , গীতিন্দ্রর একটি বোঝা । এমন বোঝা- যার হাত থেকে নিস্তার পাওয়া অসম্ভব । **কেউ কেউ আড়ালে ওকে লাম্প্ বলেও ডাকে । কেউ বলে ম্যালিগন্যান্ট টিউমার !**

সত্য সবসময় কড়া ; মিঠে কিছু হয়না । অনেকেই বিশ্বাস করতে পারেনা । তর্ক করে সত্যের সত্যতা নিয়ে ! তবুও ট্রুথ যা তাই থেকে যায় ।

বিমলা দেশে ফেরেনা । টিউমার নামে ভূষিতা এই আশ্চর্য নারী আদতে এক নীরব কর্মী ।

একে বোধহয় টিউমার না বলে বিউটি স্পট্ বলা উচিৎ । শোনা গেলো যে গীতিন্দ্রর সমস্ত কাজের পরিচালিকা ছিলো বিমলা । কথা বলতো না কাজ করতো । ম্যানেজার বলা যায় । বা সেক্রেটারি । আড়ালে থেকে মোমশিখা এগিয়ে দেওয়া বিমলাই আসলে গীতিন্দ্রর হৃদয়ে মানবপ্রেমের দীপ জ্বালায় । আগে গীতিন্দ্র কাজ ভালো করলেও সেবা শুশ্রূষা করার দিকে এত আগ্রহী ছিলো না । বিমলাই তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে চ্যারিটিতে আনে । তাকে বোঝায় যে তার অনেক আছে । অনেকের কিছুই নেই । তার এমন শক্তি আছে যে লোকে তার কথা মানে । কাজেই সে সমাজে অনেক কিছুই বদলাতে সক্ষম ।

গীতিন্দ্রর মগজ সাফাই আসলে বিমলাই করেছে ।

আর দিনের বেলায় দেখা না গেলেও বিমলা সুন্দরী প্রতি রাতে তার প্রিয় বাহন, একটি আদ্দিকালের ভিনটেজ গাড়ি নিয়ে বার হত শহর ভ্রমণ করতে । প্রতিরাতে,

কেটিজ্ কর্নার নামক ২৪/৭ খোলা থাকা এক জনপ্রিয় কাফেতে এক কাপ কফি না খেয়ে ঘরে ঢুকতো না তা যত রাতই হোক্ ।

মোটা সান্গ্লাসে ঢাকা দুই চোখ , পরণে সারা শরীর ঢাকা পোষাক আর মাথায় কেতাদস্তুর টুপী থাকতো বলে হয়ত লোকে চিনতে পারতো না । কে জানে ?

রহস্যময়ী এখন বিদেশে একাই থাকে । কারণ বিমলা কোনোদিনও লতা ছিলো না । ছিলো এক বিশাল মহীরুহ যার ডালপালার হদিস্ এই পার্থিব জগতে কেউ পেতো না !

অসুস্থ লোক , যাদের মেডিক্যাল বিল দেবার ক্ষমতা নেই ; তাদের নিজের ফার্ম হাউজে রেখে চিকিৎসা করতো বিমলা । এই কর্মযজ্ঞ তার নিজস্ব । একান্তই আপন । এর সাথে গীতিন্দ্রর সমাজ সেবার কোনোই সম্পর্ক ছিলো না ।

সেই ফার্ম হাউজকে এখন -সরকার পক্ষ **বিমলা মেডিক্যাল ইমেজিং** নাম দিয়ে চালাচ্ছে এক্স-রে ইত্যাদি করার জন্য।

স্নেহ

নিজের তিন সন্তানকে কাছে রাখার জন্য দিনে তিনটে চাকরি করে সোনিয়া ভার্গব । পতির সাথে বিচ্ছেদের পরেই তিন শিশুর দায়িত্ব পায় ।

কিন্তু তাদের ভালোভাবে মানুষ করতে না পারলে সরকার ওদের কেড়ে নেবে । এইদেশে প্রতিটি বাচ্চা সুযোগ পায় ভালোভাবে মানুষ হবার । বাবা ও মা অক্ষম হলে ওদের দায়িত্ব দেওয়া হয় অন্য কোনো দম্পতির ওপরে যারা এইরকম শিশুদের নিতে ইচ্ছুক । অনেক সময়ই বাচ্চারা তাদের পালিত পিতামাতাকে পছন্দ করেনা ।

তাই তিনখানা চাকরি করে অত্যন্ত কষ্টের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে সোনিয়া !

ইতিমধ্যে এক স্বেচ্ছাচারি শাসক অন্য এক দেশ থেকে ক্রমাগত মিজাইল্ ছাড়ছে মজা দেখার জন্য । নরমাংস

লোভী এই মানুষের মিজাইল্ ;একের পর এক এসে পড়ছে মহাসমুদ্রে ।

সোনিয়ার দেশের বড় শহরেও পড়তে পারে !

সরকার পক্ষ থেকে ওদের শেখানো হচ্ছে যে মিজাইল্ পড়লে কী করতে হবে । কিন্তু সোনিয়া নিরুপায় । ওর

কোনো উপায় নেই এইসব শেখার ; কারণ সেই তিন চাকরি !

ডেটিং

প্রথমবার ডেটিং করতে গিয়ে অপদস্থ হয়েছিলো গাগারিন্ হাতী । গাগা বলে ডাকতো ওকে । তাই ওর ডেট বলে ওঠে :: **তুমি তো নারী , লেডি গাগা -** এরকম ছেলেদের মতন সেজে এসেছো কেন ? তোমার যা চেহারা তোমাকে কোনো মেয়ে মন দেবেনা ।

তির্যক মন্তব্য আরো শুনেছে । নানা কারণে ।

একটু মেয়েলি গলার স্বর ওর । হাঁটেও হাঁসের মতন । হয়ত তাই । বন্ধুরা বলতো :: হন্‌হন্ করে হাঁট ! এরকম মেয়েদের মতন কোমড় দুলিয়ে যাচ্ছিস্ কেন ?

অপমানিত হয়ে আর বিয়েই করেনি ।

পরে ওর প্রথমা সেই ডেট্ যার নাম শেফালি হাপাগামা সে এখন শহরের নামী মহিলা । মহিলাদের রাইটস্ নিয়ে কাজ করে । মেয়েদের নানান সমস্যা ও শোষণ নিয়ে নিয়মিত অভিনয় করে করে নাম করেছে । তবে লোকে বলে ওর কাজে গভীরতা যত না আছে তার

চেয়ে ওকে দেখতে অপূর্ব বলে বেশি ভীড় হয় ওর সভায় ।

নিজেকে গ্ল্যামার ওয়ার্ল্ডের শিখরে দেখতে আগ্রহী । ওর লক্ষ্য যুবতী ডায়ানা । তাঁর মতন কাজ করতে চায় । কাজ প্লাস রূপ দুটৈ থাকবে ওর !

মেলানোমা ভয়ঙ্কর এক চর্মরোগ । স্কিন ক্যান্সার ।

সমুদ্র নগরীর সৈকতে ; সমুদ্র-মন্থন করতে করতে শেফালি, মেলানোমার শিকার হয় ।

অপরূপ চামড়া দগদগে ঘায়ে ভরে যায় !

ক্রমাগত রক্তপাত হয়ে হয়ে, দেহের উপরিভাগের টিস্যু একদম রক্তাক্ত হয়ে যায় ।

এমন অবস্থা হয় যে শেষে ওকে নগ্ন অবস্থায় মাটিতে- কাগজের ওপরে শুইয়ে রাখা হত । পচা গন্ধে কেউ ঘরে ঢুকতো না ।

গ্লামারাস্ এই পরী আজ সবার ঘৃণার পাত্রী । অথবা করুণার ।

গাগারিন্ ; কোনো কজের জন্য বিশেষ কাজ করেনা তবুও শেফালিকে গিয়ে দেখে এসেছে । ফুলের ঝাড় রেখে এসেছে ওর ঘরে ।

ও কান্নাভেজা গলায় বলেছে :: আমার শেষ সময়ে কেন এসেছো ? তুমি সব ভুলে গেছো ? সেইদিন সেইক্ষণ সেইসব কথা ও লাঞ্ছনা ?

উত্তরে গাগা শুধু হেসেছে । বড় করুণ সেই হাসি ।

তারপর বলেছে :: তুমি তো আমার সাথে জোক্ করছিলে । আমি সিরিয়াস্লি নিইনি ওগুলো ।

আর আমি দেখতে মন্দ বলে হয়ত তোমার জীবনে ঠাঁই পাবোনা কিন্তু ছায়াপথে তোমার সঙ্গে চিরদিনই আছি !

মৃত্যুর অন্ধকারে তুমি আমার মেয়েলি অবয়বটা খেয়ালই করবে না ।

ইতর -ঘেউ ঘেউ

বাবাকে চড় মেরেছিলো নারদ । নারদের বাবা পরাশর খেট্টি এমন এক সম্প্রদায়ের লোক যেখানে অবিবাহিত মেয়েদের ও যুবতী বিধবাদের বাধ্য করা হয় পরপুরুষের সাথে শয্যা ভাগ করে নিতে । বলা হয়- এগুলি নারীর দৈহিক ব্যালেন্স ঠিক রাখতে করা হয়, যাতে তারা বিপথে না যায় । অচেনা লোকের সাথে শুতে শুতে ; অনেকে ভয়াল যৌনরোগের শিকার হয়ে মারা গেছে । ইদানিং এইড্‌স্‌ ওদের পরিবারে মহামারি হিসেবে দেখা দিয়েছে ।

নারদের এই প্রথা পছন্দ ছিলো না কোনোদিনই ।

এখানে নারীর মন নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না । তার দৈহিক ব্যাপারটা বেশি গুরুত্ব পায় ।

প্রতিবাদ করেছে , কেস করার হুমকি দিয়েও বিশেষ সুবিধে না হওয়ায় নারদ, ওর জন্মদাতা পিতাকে কষে এক চড় মেরেছে । ওর সহোদরা খুব অল্পবয়সে বিধবা হয় । তারপর তার আবার বিয়ের ব্যবস্থা না করে ;

কোনো সুস্থ সমাধানে না গিয়ে ; এই প্রাচীন প্রথা ব্যবহার করে ওর বাবা । **খায় নারদের চড় আর ওদের পোষা কুকুর উপালির কামড় !**

সবাই ভেবেছিলো যে ওদের মা- যে তখন অন্য শহরে গিয়েছিলো কাজে , সে ফিরলে একটা রক্তারক্তি হবে নারদের চড় মারার জন্য । **বাবাকে মারা যে সে কথা ?**

মা কিন্তু ছেলের জন্য গর্বিত । বলে :: **ঠিকই করেছে । বাপ্‌কে চড় মারেনি আমার ছেলে ! সে এমন কুরুচিকর কাজ করতেই পারেনা । সে সাহসী ও সভ্য মানুষ তাই আদতে থাপ্পড় মেরেছে এক বুড়া ইতর বিশেষকে যে মাথা না ঘামিয়ে কেবল ঘেউ ঘেউ করে !!**

সোনাম্মা

জামপুরে এক সেবাশ্রম- ঝাড় দিয়ে পরিষ্কার করে এক বুড়ি । তার নাম সোনাম্মা । বয়স তার অনেক । কালোবরণ , সাদা চুল , সোনার একটি বড় নাকছাবি পরা । কানের লতি কেটে গেছে ভারী দুলের কল্যাণে ।

দু-তিনখানা সিল্কের শাড়ি পরে থাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে । একটা পেস্তা ও নীল পাড় , একটা গোলাপী আর বেগুনি পাড় ও তিন নম্বরটি আকাশী ও লাল পাড় ।

মুখে বয়সের ছাপ । ওর পক্ষে যতটা সম্ভব ও পরিষ্কার- পরিচ্ছন্ন হয়েই থাকে ।

পথপাশে একটি পরিত্যক্ত দোকানে বাস করে । একটা জানালা নেই । কেউ খুলে নিয়ে গেছে ! অন্যটায় পচন ধরেছে । দরজায় লাগানো বিরাট চটের পর্দা । লজ্জা নিবারণের জন্য । **রাস্তার কুকুরেরা বসে পাহারা দেয় ওকে।**

কৈশোরে, ইঞ্জিনীয়ার হবে বলে গ্রাম থেকে পালায় । ওখানে মেয়েদের কেউ স্বাধীনভাবে বাঁচার সুযোগ দেয়না । ওর জন্যই -খামোখা ওর বাড়ির লোককে জ্বালিয়ে মারবে তাই সে পালিয়ে আসে । কিন্তু ওর স্বাধীন মনোভাবের জন্য ওর অন্য বোনেদের মাথা মুড়িয়ে, ঘোল ঢেলে গ্রামের লোকেরা অপমান করে ।

ইদানিং ঐ গ্রামে ; সবাই মোবাইল ব্যবহার করে ।

টুকিটাকি সব ব্যাপারে মোবাইল ব্যবহৃত হয় ।

মেয়েরাও করে কারণ স্বামীরা ; তাদের প্রিয় স্ত্রীদের সাথে ও কন্যাদের সঙ্গে মোবাইলেই কথা সারে ।

ইঞ্জিনীয়ার হতে চাওয়া সোনাম্মার মাথা থাকে আজ বালিশের বদলে ঝাঁটার ওপরে । জীবন যুদ্ধে ক্লান্ত সে এখন । আর গ্রামীণ মানুষ মাথা দেয় মোবাইল ফানুসের স্বর্ণ গহ্বরে !

নাম

শরৎকুমার এখন রাতের বেলায় এক বয়স্ক শিক্ষার আসরে পড়ায় । অত্যন্ত কঠিন জীবনে অভ্যস্ত শরৎ কুমার -কৈশোর থেকেই চেয়েছিলো বিদেশে যেতে । তারজন্য উপযুক্ত লেখাপড়াও করে । বৃত্তি নিয়ে পড়তে যায় । ওখানে ,পরদেশী বান্ধবী -জেনিফারের সাথে এক কন্যা সন্তান হয় । খুশী হয় ওরা । কিন্তু আজব নিয়ম সেই দেশে ! ওখানে সরকার পক্ষ নাম স্থির করে দেয় শিশুটির । বাবা ও মায়ের কোনো ইচ্ছের মর্যাদা দেওয়া হয়না । জেনিফার , নিজেও ছিলো ছাত্রী । দু:খ পেয়ে মেয়েটি আত্মহত্যা করে ।

শীতের রুক্ষ্ম বেশের দিকে চেয়ে মনে হত শরৎ কুমারের যে প্রকৃতি বলছে - **এরপরে আসবে বসন্ত কিন্তু বাস্তবে যার মনে হিম লেগেছে তার হৃদয়ে কখনোই পুষ্পরাগের রং দেখা যাবে না !**

জেনিফার আত্মহত্যা করার পরে, শরৎকুমার ঐ দেশ ত্যাগ করে । মেয়েকে একা মানুষ করে তোলে নিজ জন্মভূমিতে বসেই । দ্যাখে, যে দেশেও মানুষ আছে আর মানুষ জন্মায় । ওদেরও সবার দুটো হাত ও পা ।

মেয়েও ভালো মানুষ হয়েছে ।

এখন বয়স্ক মানুষের শিক্ষায় ডুবেছে শরৎকুমার ।

বিদেশে তো কত বুড়োবুড়ি লেখাপড়া শেখে ।

দেশেও সেরকম করতে ইচ্ছুক শরৎ আর তার মেয়ে-

টঙী । হ্যাঁ , এই নামই দিয়েছিলো ওর ওয়াং দেশের সরকার বাহাদুর ।

---ভাগ্যিস্ তোর নাম দেয়নি ঢঙী !

এই বলে ক্ষ্যাপাতো ওকে ক্লাসের বন্ধুরা ! দূর থেকেই জ্যোৎস্না ভেজা বন- মাধুরী ছড়ায় । বনপথে হাঁটলে দেখা যায় যে সেখানেও কত নুড়ি পাথর । ঠোক্কর খেতে খেতে যেতে হয় সবাইকে । তবেই গন্তব্যে পৌঁছানো যায় । রামধনু দূর থেকেই মনোরম । কাছে গেলে হাতে রং লেগে টেগে !!

পাউরুটি

অগস্ত্য ; বিদেশের এক বেকারিতে বহুদিন কাজ করেছিলো । পাউরুটি বেক্ করে করে একেবারে ওস্তাদ হয়ে উঠেছিলো ।

মধ্যজীবনে-একবার এক বন্ধুর অনুরোধে যায় শহরতলির নতুন গজিয়ে ওঠা স্যাটেলাইট নগরে ।

বন্ধুটি ; এখানে একটা প্রপার্টি কিনতে চলেছে তাই দেখাতে এনেছে । বন্ধু মনোহর আর তার বৌ টিপারের মন রাখার জন্য , খুব ভালো খুব সুন্দর এইসব বললেও ওর মনে হল ও রুটি বেক্ করার গন্ধটা যে পাচ্ছে সেটা ওদের জানানো ওর কর্তব্য ।

মন খুলে জানালো :: আমি কিন্তু এখানে রুটি শ্যাঁকার একটা গন্ধ পাচ্ছি !

টিপারের ঘোরতর আপত্তি অন্য কারো ব্যবহৃত জিনিস কেনায় । কারণ সে নতুন জমি কিনছে যখন তখন কেউ সেখানে আগে থেকে ছিলো , তার স্মৃতি , এনার্জি সমস্ত ওখানে জড়িয়ে আছে এরকম কোনো প্রপার্টি সে কিনবে না । যা হবে নতুন হবে । দরকার হলে জলাশয় বুজিয়ে মহল খাড়া করবে কিন্তু অন্যের ব্যবহার করা জমি ও বাড়ি কখনো কিনবে না ।

ওদের এজেন্ট বলেছিলো যে এখানে আগে কোনো বাড়ি ছিলো না। কিন্তু বলেনি যে কিছুই ছিলো না।

খোঁজ নিয়ে জানা গেলো, ওখানে এক বেকারি ছিলো। বিরাট তার দালান। সেখানে একবার আগুন লেগে নষ্ট হয়ে যায় সবকিছু। পরে ওটা পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিলো। সরকার অনেক পরে সেই বিল্ডিং ভেঙে দিয়েছে। আর একটি মোটর গাড়িও ছিলো।

সেটা কেউ নিয়ে চলে গেছে।

অগ্যাস্তের কারণে ওরা জানতে পারলো যে ওখানে রুটি বেক্ হতো নিয়মিত। তাই ওদের প্রপার্টি ম্যানেজার ওদেরকে নতুন একটা জমি দিলো।

কারণ ওরা ক্লায়েন্টদের মানুষ ভাবে। নম্বর না। তাদের আশা- ইচ্ছা/অনিচ্ছার দাম দেয়।

নতুন জমিটিতে ; বেকারি তো ছিলই না আর অন্য কিছু থাকার কোনো সম্ভাবনাও নেই কারণ ওটা একটি কৃত্রিম দ্বীপ । যা তৈরি হয়েছে সদ্য , একটি ন্যাচেরাল লেকের বুকে !!

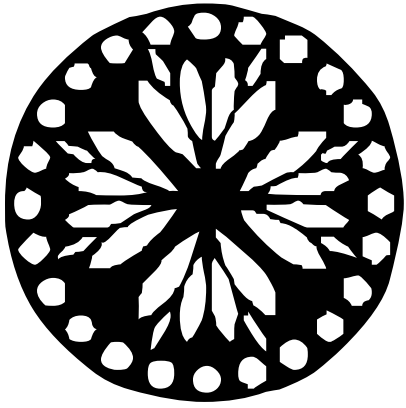

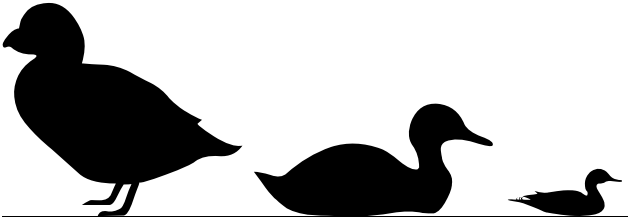

রাইকিশোরী

জানুয়ারি মাসেও কলকাতার অসম্ভব গরমে প্রাণ ওষ্ঠাগত রাইমার । বয়স প্রায় পঁচিশের কাছাকাছি , এলোচুল , টিকলো নাক অনেকটা মৃতা অভিনেত্রী মহুয়া রায়চৌধুরীর মতন দেখতে । সুন্দরী বলে একটু দেমাকও রয়েছে ওর । মেয়েটি অন্তর্মুখী । তাই দিনের অনেকটা সময়ই কাটায় নেটে বসে । বন্ধুবান্ধবের সংখ্যা নেহাত-ই মন্দ নয় । সবাই ভার্চুয়াল বন্ধু । কেউ কেউ লুক্কায়িত , শুধু বৈদ্যুতিক তরঙ্গে জীবন্ত । কেউ কেউ বাস্তবে নেমে আসে । তেমনই এক বন্ধু সজল পান । নামটাই প্রথম আকর্ষণ করে রাইমাকে ।

রাইমার নাম ত্রিপুরার নদীর নামে । রাইমা আর সাইমা নদীযুগল ত্রিপুরার চিরসাথী । তার বাবা ছিলেন ত্রিপুরা সরকারের সার্ভেয়ার । জীবনের অনেকটা সময় কেটেছে ঐ রাজ্যে । পরে কলকাতার বেহালায় এসে বাড়ি কিনেছেন । এখন ওরা ওখানেই বসবাস করে । সজলের সঙ্গে যোগাযোগ করে ওরা দুজনে এক স্বর্ণালী সন্ধ্যায় বেড়াতে গেলো ভূটানঘাট । ডুয়ার্সের এই

এলাকা বড়ই মনোরম । আগে থেকে বুক করা বনবাংলোতে এসে উঠলো দুজনে । এই প্রথম দেখা তো ! খুব সেজে এসেছিলো রাইমা ।

এমনিতেই সুন্দরী , চটকদার তার ওপরে সাজসজ্জা করে একেবারে রাজকুমারীটি ।

কিন্তু মিলন সমুদ্রের ঢেউ মনে এক আলোড়ন তোলে । যার কোনো সীমারেখা নেই । জ্বালা , তীব্র বিষের জ্বালা ! সমস্ত স্বপ্ন ভেঙে খানখান ! দহন , দহনে টালমাটাল স্বপ্নের ভূটানঘাট ।

রাইমার রাজপুরুষ এক বৃদ্ধ । বয়স আন্দাজ ৫৫ । নাতিদীর্ঘ , থলথলে ভাব চেহারায় । দেখে মনেই হয়না ইনি লিখতে পারেন এত সুন্দর সুন্দর ই-চিঠি !

ভেঙে পরে রাইমা । মনের কষ্ট মনেই চেপে রাখে । সপ্তাহ-খানেক পরেও বাড়ি না ফেরায় পুলিশে খবর যায় । তদন্তে জানা যায় ভূটানঘাটের এক বনবাংলোয় তাকে ধর্ষণ করে পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে । পোড়ানোর আগে ছোট ছোট পিস করে ফেলা হয়েছিলো ।

বনবাংলোর ম্যানেজার জানান যে ঘটনার পরদিন রাতে এক বৃদ্ধ পর্যটক ,হঠাৎ তার জন্মদিন উপলক্ষ্যে

বনবাংলোর বাগানে পার্টি দেন । সেখানে মদের ফোয়ারার সঙ্গে সঙ্গে আনলিমিটেড্ কাবাবের আয়োজন ছিল । এত কাবাব উনি কোথায় পেলেন কেউ জানেনা । অর্ডার দিয়ে বাইরে থেকে আনিয়ে ছিলেন ভেবেছিলো সবাই ।

আর কাবাবের স্বাদ ছিলো অদ্ভূত সুন্দর । শোনা যায় নরমাংস খুবই সুস্বাদু ।

ঝুমরি

গুরুমারা ড্যামের কাছেই আছে বনজ মানুষের ডেরা । ওরা রিংপিং আদিবাসী । ক্যানবেরা শহরের অনতিদূরেই এই অরণ্য ও ড্যাম । সিভিল ইঞ্জিনীয়ার শিবার্ঘ্য এসেছিলো এই দেশে কাজের আশায় । ভারতের বিল্ডিং বানানোর সময় ইট, বালি , সুড়কি, কনক্রীট ইত্যাদিতে ভেজাল মেশানো আর তারপর বাড়ি ভেঙে অনেক মানুষ মারা যাওয়া কিংবা মিস্ত্রী আর কারিগরদের নিহত হওয়া এক আজব কান্ড বলে মনে হত শিবার্ঘ্যের । কাজেই সে স্ত্রী ও সন্তানকে নিয়ে এই পরবাসে এসে হাজির হয় । মধ্য চল্লিশে এসেছিলো বলে কাজের সমস্যা হয়েছিলো ।

বিল্ডিং ইন্সপেক্টর হিসেবে কাজ করলেও স্বচ্ছল জীবন যাপনে সক্ষম ছিলো না । বাকি জীবনটা তাই অভাবেই কাটে । পরে ক্যাঙারুর পকেটে করে ড্রাগস্ চালান করে কাটায় । ধরা পড়ার আগেই কাজ ছাড়ে , আর করেনা । স্ত্রী চায়নি দেশে ফিরে যেতে । কাজেই ওরা মেনস্ট্রিম সমাজে না থেকে আদিবাসিদের সাথে মিশে যায় ।

ওদের মধ্যে , অতি অল্প মাইনেতে নির্মাণ কর্মী হিসেবে কাজ করতো শিবার্ঘ্য । একমাত্র কন্যা সাহানা বেড়ে ওঠে আদিবাসিদের সাথে ।

স্ত্রী রেণু মারা গেলে সাহানা বাবার দেখাশোনা করতে শুরু করে । পরে এক আদিবাসি যুবক, পরাগের সাথে থাকতে শুরু করে । ওদের মধ্যে বিয়ের তত চল নেই । কেউ কেউ করে । কেউ করেও না । পরাগ আর সাহানা বিয়ে করেনি । ওদের এক মেয়ে পিয়া । পরাগের আসল নাম পর্গা । ওকে সাহানারা পরাগ ডাকে । গুরুমারার মতন আমাদের গরুমারা ফরেস্ট আছে কাজেই অনেক আদিবাসি নামও মিলে যায় আমাদের সাথে । যেমন ডাকু, পানু, পিলি, রিংঝি , বিন্দি, মীরা , নিলি, সুরি ইত্যাদি ।

পরাগ ও সাহানার মেয়ে , পিয়া স্কুলে পড়ে । ওদের আরেক মেয়ে আছে । নাম তার ঝুমরি ।

দুজনের বয়স প্রায় কাছাকাছি । ১৫ /১৬।

পরাগ আজকাল মানুষকে গাইড করে । ওদের আদিবাসি সভ্যতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করে । টুরিস্ট গাইড ।

একটা পাহাড় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে পথ মাঝে । সেই পাহাড়টি আদতে এক আদিবাসি রাজকন্যে ।

ওদের প্রিস্ট , ওকে পাহাড় করে দেয় মায়াবলে । জাদু দন্ড ছুঁইয়ে । সেইসব গল্প বলে পরাগ ।

আমাদের যে এই কাহিনী শোনাচ্ছে সে কিন্তু মানুষ নয় । তার পরিচয় নতুন করে দেবার কিছু নেই কারণ সে না থাকলে সেইভাবে কিছুই থাকতো না । সে হল সময় । **আমরা সময় এর কাছে এই গল্প শুনছি ।**

সময়ই একমাত্র পারবে এইসব গল্প, একদম খাঁটি ভাষায় শোনাতে ।

ঝুমরিকে দেখে মনে হয় আদিম যুগের মানুষ । অনেকে ওকে বনমানুষও ভাবে । ও অল্প অল্প কথা বলে। আকার ইঙ্গিত করে । স্লেটে লেখে । দুই হাতে তামার বালা পরা ।

হাসে, কাঁদে , ভালোবাসে । **ঝুমরি ; এক চীনা যুবককে মন দিয়েছে ।** তার নাম গ্রেগরি ।

এখানে এসে অনেক চীনা মানুষ- ওদের আজব নাম বদলে ইংলিশ নাম নিয়ে নেয় ।

গ্রেগরিও সেরকম একজন । ও এখন বনে থাকে । পরাগের সহকারি । গাইড । জুনিয়র গাইড । হাতে লন্ঠন নিয়ে গাঢ় সন্ধ্যায়, বনপথে চলাফেরা করে একদা শহুরে গ্রেগরি ।

চীনদেশ থেকে এই দেশে আসে । পরে অরণ্যের ডাকে আদিবাসি সমাজে গিয়ে মেশে । **ওকেই মন দিয়েছে ঝুমরি ।**

এখন ঝুমরি নিয়মিত পিরিয়ডের কবলে পড়ে । প্রথম যখন এর স্পর্শ পায় তখন উৎসব করেছিলো সাহানা । সবাইকে জানানোর জন্য যে তার আরেকটি মেয়ে আজ থেকে বড় হল !

ঝুমরি তো গ্রেগরির জন্য পাগল ! ওকে ডাকে শিস্ দিয়ে, চুমু দেয় আর মাথায় চাটি মেরেও ডাকে !

গ্রেগরি কিছুতেই ওকে বিয়ে করবে না । কারণ ঝুমরি এক যুবতী বনমানুষ , যার বিবর্তন হয়েছে প্রবল ভাবে এবং সে মানবী হয়ে উঠেছে মানুষের স্পর্শে ! তার নিয়মিত রক্তক্ষরণও হচ্ছে মেয়েদের মতনই ।

জিনের চেয়েও পরিবেশ এইক্ষেত্রে বেশি শক্তিশালী ।

মানুষের মাঝে থাকতে থাকতে সেও মানুষ !

কিন্তু গ্রেগরি তো উন্মাদ নয় ; তাই এই বিয়েতে রাজিও না ।

বলে :: আমি ঝুমরিকে খুব ভালোবাসি কিন্তু প্রেমিকার মতন নয় ---বন্ধুর মতন ----------স্ট্যান্ডার্ড্ ডায়লগ ।

ঝুমরি নাওয়া খাওয়া ছেড়েছে । গ্রেগরিকে চাটি মেরে মেরে ওর হাতে কড়া পড়ে গেছে । তবুও ছেলে ভুলানো সহজ নয় !

একদিন হঠাৎ ,বিষধর সাপের ছোবলে প্রাণ গেলো গ্রেগরির !

এই বনে অনেক সাপ । ঝুমঝুমি নামে এক সাপ আছে । তারই ফণায় প্রাণ গেলো !

ঝুমরি কেঁদে ভাসাচ্ছে ! সাহানারও বুক ফাটছে মা হিসেবে ! **মরেই গেলো তাজা ছেলেটা আর ঝুমরি মেয়েটা এই শোকে প্রায় আধমরা !!**

তবুও কিন্তু বিয়ে হল গ্রেগরির সাথেই । চীনামানুষ আর অন্যান্য বহু মানুষদের ক্ষেত্রে বিয়ে হয় মৃত্যুর পরেও । ঘোস্ট ম্যারেজ বা প্রেতের বিয়ে বলা হয় একে ! ভূতের বিয়ের জন্য অনেক মৃতদেহ চুরিও হয় ।

যদি কোনো কারণে জীবিত অবস্থায় বিয়ে সম্ভব না হয় তখন মৃতের দেহকে সাজিয়ে বিয়ে দেওয়া হয় । এতে আত্মার শান্তি হয় ।

গ্রেগরিকে বর সাজিয়ে বিয়ে দিলো সাহানা , নিজ কন্যা ঝুমরির সাথে ! গ্রেগের অনুমতির কোনো দরকারই নেই এখন !

ঝুমরি খুব খুশি ! বারবার মৃত গ্রেগরির মাথায় চাটি মারছে আর প্রেত ওষ্ঠে চুম্বন দিচ্ছে ! হয়ত একত্রে, স্বর্গেলাভের আশায় ।

বনমানুষ থেকে মানুষ হয়ে ওঠা ঝুমরি হঠাৎই যেন ভাগ্যের খেয়ালে হয়ে উঠলো প্রেতিনী ; অদৃশ্য এক জাদুবলে ! Metamorphosis!!

উৎসব

আলুর উৎসব করে মানুষকে যুদ্ধের দামামা বাজা থেকে রক্ষা করতে উৎসুক একদল মানুষ যার মধ্যে মূল মানুষ এক বাঙালী চাষী । উত্তর ভারত থেকে বিদেশে আসে কৃষি বিদ্যা নিয়ে পড়তে ।

উত্তর ভারতে ওরা বংশ পরম্পরায় চাষবাস করে । **তবে একটু উন্নত চাষী আর কি !**

এখন প্রফেসরি ছেড়ে এই মানুষটি আলুর উৎসব করছে বছরে দুবার । রঙ বেরঙ এর আলুর চাষ হয় ওর গ্রামে যা ওর নতুন ঘর । এখানে চাষীদের সঙ্ঘবদ্ধ করে করে, বাঙালী যুবক- নানানভাবে সজ্জিত উৎসব চালু করেছে । সেখানে আলুর নানান পদ রান্না করা হয়, খাওয়া ও দেখার জন্য।গানবাজনা হয় আলু নিয়ে ---আলু ক্ষেতে ঢুকে ; আলু চাষ করা ও আলু শাক ইত্যাদি দেখা যায় । এখানে বিভিন্ন আলু দেখা যায় । কোনোটা জেনেটিক্যালি তৈরি কোনোটা বা প্রাকৃতিক ।

সোনালি, গোলাপী, হলুদ, সাদা খোসা বিহীন আলু , সুগার রুগীর জন্য বিশেষ আলু , নীল আলু , বাদামী আলু সমস্ত পাওয়া যায় ।

শিশুদের জন্য, নানান মজাদার খাবার ও আলু নিয়ে কার্টুন ও নাটক হয় । বড়রা ; আলু চাষীর একদিন ও যুদ্ধ হলে কী সমস্যা হবে- সমস্ত অভিনয়ের মাধ্যমে দেখতে পায় ও তারজন্য জোটবদ্ধ হয়ে বিভিন্ন অ্যাকশান নিয়ে থাকে । প্রতিবছর এই উৎসব হয় ।

মানুষকে সচেতন করার কাজটা মূল হলেও এমনি লোকে আনন্দ নিতেও আসে । কেবল বাঙালী বাবুর মুখ ভার থাকে সবসময় ।

কেউ কারণ জানতে চাইলে বলে থাকে যে এখানে বসে আলু নিয়ে এত উৎসব করছে কিন্তু দেশে , ওদের গ্রামে অনাবৃষ্টি ও খরার কবলে পড়ে কত ক্ষেত নষ্ট হয়ে গেছে । চাষীদের অনেক ক্ষতি হয়েছে ও হচ্ছে । কাজেই পরবাসের আলু উৎসবে যে এত আনন্দ হচ্ছে তা ১০০ ভাগ শুষে নিতে অক্ষম মানুষটি ।

আজব মিল ঘটনার সঙ্গে । মানুষটির নাম হল আলোক ধর ।

জ্যোতিকা

জ্যোতিকা পরবাসেই বড় হয়েছে । তিন প্রজন্ম এখানেই আছে । দাদু এসেছিলো খনি শ্রমিক হয়ে । পরবর্ত্তীকালে ওরা লেখাপড়া শিখে নিজেরা নানান ফিল্ডে চলে গেছে ।

কৈশোর থেকেই অশ্বপ্রেমী ছিলো জ্যোতিকা ।

নিয়মিত রেসে নিয়ে যেতো ওর বাবা, ওকে ।

ছোটবেলায় একটা বই পড়েছিলো যে বড় হয়ে তুমি কী হতে চাও ? সেখানে নানান পেশার মধ্যে জকিও ছিলো । জ্যোতিকা একবারে সেই জকি পেশা বেছে নেয় ।

বাবাও আপত্তি করেনি । খুব ভালোভাবে মেয়েকে ট্রেনিং দিয়ে, একজন ভালো ঘোড়সওয়ার তৈরি করে ওর বাবা করুণাসুন্দর । পরে জ্যোতিকা নিজেও অনেক ঘোড়াকে ট্রেন করেছে যারা নানান পুরস্কার

পেয়েছে ও অন্যান্য ঘোড়াপ্রেমীদের আস্তাবলে ঠাঁই পেয়েছে।

সাহসী নারী বলে পরিচিতা জ্যোতিকাকে ওর আস্তাবল থেকে বহিস্কার করা হয় নানান ব্যাভিচার ধরে ফেলার জন্য । বিদেশে এইসব ক্ষেত্রে- নানান উকিল পাওয়া যায় যারা কোর্টে কেস লড়ে দেয় বিনাপয়সায় । কেস জিতে গেলে ওরা ফিজ্ নেয় । জ্যোতিকা ; আইনি লড়াই লড়লেও জিততে পারেনা ,প্রমাণের অভাবে । নিরীহ ঘোড়ারা দৌড়ে যায় আর আড়ালে মানুষের কদর্য নীতি তাদের বসিয়ে দেয়-- **হেরে যাওয়া অশ্ব, দৌড়াতে অক্ষম বা হেরো বলে।**

এক সেরা , সাহসী কিন্তু নরম মনের মেয়ে হিসেবে আজ আর কেউ তাকে চেনে না । অস্তিত্ব রক্ষাই দায় হয়ে উঠেছে , তার কাছে । কিছুদিন বাবা ও মায়ের সাথে ছিলো । কিন্তু এইভাবে সারাজীবন থাকা চলেনা । আর বাবা-মাও চিরদিন থাকেনা ।

কাজেই সে এমন একটা জিনিস করলো যা বিচিত্র হলেও অনেকের কাছে উপকারী ।

জ্যোতিকা, পশুর ক্রেশ্ চালায় । মালিক চাকরিতে গেলে এখানে নিজের পোষ্যকে রেখে যায় । এখানে

ওদের ভালোমন্দ খেতে দেওয়া হয় ও মারধোর একেবারেই দেয়না কেউ । আর অসুস্থ ঘোড়াদের, যাদের মালিকেরা ছেড়ে দেয়, তাদের শুশ্রূষা করে আবার সুস্থতায় নিয়ে আসা হয় ।

জ্যোতিকা আগে একাই কাজ করতো । বাবা ও মা তাকে সাহায্য করেছে অনেকদিন ।

পরে অনেক ক্যান্সারে আক্রান্ত মানুষ, যারা এখন রেমিশানে আছে কিংবা আয়ু আর বেশিদিন নেই কিন্তু কর্মক্ষম আছে আর শেষসময় জীবনের মানে খুঁজতে গিয়ে এই সংস্থার সংস্পর্শে আসে -- তারা এই কর্মযজ্ঞ এগিয়ে নিয়ে যায় ।

সুমধুর এই ক্ষণ ! কেউ কাউকে জাজ্ করেনা আর সবাই মনপ্রাণ ঢেলে কাজ করে ।

সমাজের ক্ষত নিয়ে বেঁচে থাকা জ্যোতিকা এবার এমন সামাজিক মানুষের দেখা পেয়েছে যারা গড়তে জানে । ভাঙতে নয় । তাই তরী ডোবার সময়ও শক্ত হাতে হাল ধরে থাকে , জীবন নদে ।

আশা

আশায় শুধু চাষা নয় বাঁচে অনেকেই । এই যেমন সুখময় । সুখময় শেঠ, যাকে লোকে পরবাসে গুস্তভ বলে চেনে ।

লোকটি বহুবছর স্নান করেনি । গায়ে ময়লার পুরু আস্তরণ । মাথার চুল আকাশ থেকে জমিন ছুঁয়েছে !

ময়লার মধ্যে দিয়ে উঁকি মারছে একচিলতে উজ্জ্বল নয়ন ।

ওর বাবা ছিলো সেনাবিভাগে এয়ারম্যান ।

সেনাবাহিনীতে উচ্চপদে কাজ করা মানুষেরা ওদের হেয় করতো । নানান প্রটোকলের কবলে পড়ে, সেন্সিটিভ অফিসারেরাও কিছু করতে সক্ষম ছিলো না । কমিশন্ড্ আর নন্-কমিশন্ড্ তো ছিলো--আরো নিচে যারা তাদেরও নানান ব্যাপারে একটা সীমার মধ্যে থাকতে হত । সেটা কেবল কর্মজীবনে নয় , বাস্তবেও । একজন এয়ার-ম্যানের ছেলে যে কিছু করতে পারে ,

ক্লাসে ভালো নম্বর পেতে পারে তা যেন কল্পনারও অতীত !

তবুও আশা নিয়ে বাঁচে মানুষ । যারা ভিক্‌টিম্ , তারাই বোঝে স্ট্রাগেলের অর্থ । এরই মধ্যে অনেক স্বপ্ন নিয়ে নিজের সন্তানদের মানুষ করে এয়ারম্যান বরুণ শেঠ্ ।

পরে ওর ছেলে সুখময় বড় অফিসার হয় , বায়ুসেনার । শুধু তাই নয় সে নিজের জুতো সেলাই থেকে চন্ডীপাঠ সব নিজে করতো । লোকে অবাক হত ।

অনেকে বলতো :: এত বড় অফিসার , নিজের জুতো নিজে পালিশ করছেন ?

সুখময় বা গুস্তভ হেসে বলতো :: আপনি কার জুতো মোছেন ?

ওর স্ত্রীর নাম গরিমা হলেও অত্যন্ত নির্মল মেয়ে সে । এতবড় এক অফিসারের পত্নী হওয়া সত্ত্বেও একটুও অহঙ্কার নেই তার ।

কেউ প্রশ্ন করলে বলে :: আমার নিজের পরিচয় আছে । আমি একজন নর্তকী ও শিক্ষক । আমার অন্য কারো পরিচয়ে পরিচিত হবার প্রয়োজন নেই । স্বামীর

পদোন্নতিতে আমি অসম্ভব খুশী কিন্তু এর থেকে কোনো সুবিধে নিতে চাই না । আমার পরিচয় আমি নিজেই । আমি অন্য কারো মত হতে চাইনা ।

আমার স্বামী যে সবার সাথে বসে জেনেরাল মেসে খায় তাতে আমার একটুও ইজ্জৎ হানি হয়না ।

সমাজের নানান অন্যায় ও বৈষ্যমের পাল্লায় পড়ে

গুস্তভ, অনেক আগে থেকেই বামপন্থী মতে বিশ্বাসী ছিলো ।

কাজ থেকে অবসর নিয়ে, স্নান করা বন্ধ করে । চুল না কেটে ও দাঁড়ি না চেঁছে হয়ে ওঠে একটি আস্ত বটগাছ । সেই লতাপাতা ও শিকড়ে চড়ে অনেকে ওকে দেখতে আসে ।

সুখময় যার নাম সে কি কখনও দুখী হতে পারে ?

মনে হয়না । তাই ওর যুক্তি হল এই যে :: শুনেছি ১০০ বছর পরে আবার দুনিয়ায় কমিউনিজম্ ফিরে আসবে । মানুষের মঙ্গল হবে তাতে । আমি তো ততদিন বাঁচবো না তাই যে কদিন জীবিত আছি ; আমি নিজেকে এইভাবেই রাখতে চাই । আর নিজের

দেহের পেছনে খরচ করা অর্থ আমি দান করে দিই মানুষকে ।

যেহেতু থাকি লোকালয়ের বাইরে ; তাই কারো অসুবিধে হয়না আমার জন্য । আমার টক্সিক্ গন্ধের জন্য । **আর এতকিছুর মধ্যেও আমার আনন্দ এইটুকু যে আমার স্ত্রী আজও আমাকে চুমু দেয় !**

ইলেক্ট্রা

ইলেক্ট্রাকে দেখলে কেউ বলবে না যে সে এত দরদী ।

সবসময় সিগারেট ও মদে অভ্যস্ত এলি বা ইলেক্ট্রা দেখতে ডাকিনীর মতন । চুপ্‌সানো দুই গাল, অজস্র ট্যাটু করা আর সবসময় এমন পোষাক পরা যাতে বক্ষযুগল একদম হৃষ্টপুষ্ট হয়ে থাকে । ওর মতে মানুষের বয়স হয় মনে । দেহে নয় । আত্মাও অমর আর দেহও নানান কারসাজির ফলে ও যোগ ব্যায়ামের ফলে তরতাজা রাখা যায় । কাজেই দায়ী আসলে মন ।

মাঝে কিঞ্চিৎ মোটা হয়ে পড়াতে এলি যোগাতে যায় । অনেকদিন হয়ে গেলেও ওজন কমাতে সক্ষম না হলে ওকে ওর ট্রেনার বলে সময় দিতে ।

সময়ই বড় কম ওর হাতে । তো যাইহোক্‌ সে এক আজব কাজ শুরু করেছে । পুরনো বই কিনে তাতে

নতুন বইয়ের সুবাস ভরে বাজারে বিক্রি করছে কম দামে।

গরীব মানুষের বাচ্চারা নতুন বই কিনতে পারেনা দামের জন্য । কিন্তু বইয়ের সুন্দর গন্ধ কার না মনভোলায় ? তাই ইলেক্ট্রা , এই পন্থায় ওদের আনন্দ দেয় । আর এত কিশোর, কিশোরীর সাথে ফেসবুকে যুক্ত হয়েছে যা ঈর্ষণীয় !

পিকনিকে গিয়ে, ওদের সাথে দৌড়ঝাঁপ করে করে এখন চর্বি কমে গেছে।

ট্রেনারও অবাক ওর সাফল্য দেখে।

যোগা যা সহজে পারেনি ; একটি বিশেষ কাজের প্রতিজ্ঞা তাই করিয়ে ছেড়েছে এলিকে।

অবাক হবারই কথা ।।

মাফিয়া

মাফিয়া বলে ডাকলেও আসলে এই চীনা মহিলা মাফিয়া নয় । আগে জেলি ফিশ্ ধরতে যেতো ।

জেলি ফিশ্ ,ওরা খুব খায় । সমুদ্রে এখন এই মাছ ধরা বারণ । কারণ অনেক জেলে নকল জেলিফিশ্ বাজারে বিক্রি করছে । এগুলি বৈজ্ঞানিক উপায়ে সৃষ্ট , আর রিয়ল নয় । একটা সময়, কোনো দূর্যোগের পরে সৈকতে হাজার জেলি ফিশ্ মরে পড়ে ছিলো । বিশেষ করে কোনো বিষের জন্য । তাই মহিলা , টুংটাং যার নাম সে এখন চীনাবাজারে বসে ।

লোকের ফেলে দেওয়া জিনিস , কখনো ভালো কখনো ভাঙা , জড়ো করে নিয়ে যায় বাসার সামনে থেকে । একটা টেম্পো নিয়ে আসে । তারপর সেইসব জিনিস সারিয়ে, পালিশ করে গরীব দেশে পাঠায় । ওরাও আমদানি করে এইসব জিনিস, ওদের বাজারে বিক্রি

করে । **ওর বিক্রি এত বেড়ে গেছে যে সস্তায় দিলেও আজ ও বড়লোক । তাই ওকে লোকে মাফিয়া বলে মজা করে ।**

টুংটাং ; এখন সারাটা দিন হুঁকো খেয়ে কাটায় । কুতকুতে চোখে রঙীন চশমা । আর মোটা মোটা চালে, গোটা গোটা সবজি দিয়ে রাঁধা এক অদ্ভুত ফ্রায়েড্ রাইস এক চামচ্ করে করে খেতে অভ্যস্থ , রোজ ।

এতে নাকি ইয়ে বাড়ে , মানে ওর স্যাক্স্-টা একটু বেশি তো তাই ঐ মিথিক্যাল রাইস খেলে ওর আদতে ইয়ে বাড়ে ।

ছল

টায়রা ; নিজের বিভাজিকা প্রদর্শন করতে ভালোবাসে ।

ভারতীয় মেয়ে হওয়াতে ওর বাবা ও মা এগুলি অপছন্দ করে । মেমসাহেবদের মতন খাটো পোশাক পরা ওদের মতের বিরুদ্ধে । অনেক মানুষের মতন ওরাও জনসাধারণের সামনে, পাবলিক প্লেসে সন্তানকে স্তনের দুগ্ধপান করানোর ঘোরতর বিরোধী ।

টায়রা তবুও নিজের সৌন্দর্য্য প্রদর্শন করতে ভালোবাসে ।

ইদানিং ব্রেস্ট ক্যান্সারের ব্যাপারে, সতর্কতা জারিতে নেমেছে । নিজের সুগঠিত , পালকের মতন নরম বক্ষযুগল মেলে ধরে দেখায় কী করে ব্রেস্ট চেক্ করতে হয় ইত্যাদি । কেউ নিন্দাও করেনা বরং অজস্র ধন্যবাদ পায় । **টায়রা ভালো আছে । জীবনটাকে কিঞ্চিৎ ঝাঁকিয়ে নিয়ে ; খুব ভালো ।**

চাঁদ মানুষ

পুরাতন কালে , উইলসনের পরিবারের লোকেরা চাঁদের ওঠানামা দেখে ফসল ফলাতো । তখনকার দিনে এত উন্নত যন্ত্রপাতি , সার ও প্রযুক্তি না থাকায় ওরা প্রকৃতির সাথে সখ্যতা করে চাষবাস করতো ।

ওকে বলতো মুন হার্ভেস্টিং ।

উইলসন এখন ; স্পেসের সাথে জড়িয়ে পড়েছে । ওর কাজ হল স্পেসে যা যাচ্ছে সবকিছু শুঁকে দেখা । কারণ ওখানে নাকি সামান্য গন্ধও মানুষের বিপদ ও ঝঞ্ঝাট ডেকে আনতে পারে । পৃথিবী থেকে যতই মধুর হোক্ না কেন ; চাঁদে চড়তে গিয়ে তো ফট্ করে জানালা , দরজা খুলে বারান্দায় দুদন্ড বসা যায়না তাই গন্ধমাদন- কেউ স্পেসে নিয়ে যেতে ইচ্ছুক নয় ।

আড়ালে উইলসনকে অনেকে মহাকাশের কুকুর বলে ডাকে । তাতে অবশ্যি ওর কিছুই যায় আসেনা কারণ এই আধুনিক যুগেও ও চাঁদের সাথে যুক্ত কাজ করতে পারছে যা ওর প্রপিতামহ ও কূল পন্ডিতেরা অনেক আগে থেকেই করছে । **ওরা চাঁদ মানুষ ।**

তাই এখন সরাসরি মুন হার্ভেস্টিং না করলেও মুন ইত্যাদিকে ডিস্‌গাস্টিং করা থেকে বাঁচাচ্ছে।

কাজেই কুকুর বলে কেউ শিস্‌ দিলেও ওর কিছুই যায় আসেনা। ও কুকুর হয়েই বিন্দাস্‌ আছে, মানুষের মনে। যথেষ্ট সম্মান পাচ্ছে একজন গন্ধ বিশারদ্‌ হিসেবে, মহাকাশচারীদের স্বপ্নের জগতে! **তাই ও মর্ফিং এর মাধ্যমে প্রায়শই কুকুর থেকে মানুষ ও উল্টোটা হচ্ছে।**

উট্

এক বাঙালী মেয়ে সুজাতা রাইয়ের সাথে দেখা হয়েছিলো মরুপ্রান্তরে। পরবাসে বিবাহসূত্রে আসে।

তারপর তার জীবন উট্, রুট, আর উটপাখির মধ্যে আটকে গেছে।

রুট্, অর্থাৎ মূলজাতীয় খাদ্য নিয়ে কাজ করে। মূলো, গাজর, কচু, বিট্, আলু ইত্যাদি।

একটি উট্পাখি পুষেছে। সে ওর অবসরের বন্ধু।

আর ওর স্বামী উটে করে মানুষকে নিয়ে ট্রেক করে। এটা ওর পেশা ও নেশা। মেয়ে উটেরা নাকি খুব সেন্সিটিভ্ ও সিন্সিয়ার। আর ওরা ভালো লোক চেনে। ওদের ট্রেনিং দেওয়া সহজ। উটের পিঠে করে সাধারণ মানুষ অনেকটা পথে ঘুরে বেড়ায়। সঙ্গে

সুজাতার স্বামী , অখিলেশও । সুজাতার মতন ওর বন্ধু হল উটেরা । উট্‌পাখি নয় ।

সারাটাদিন উটের সাথে কাটিয়ে একটুও পাশবিক হয়নি অখিলেশ । অবসরে উর্দু শায়েরী পড়ে আর দক্ষিণী হলেও হিন্দি পড়তে অভ্যস্ত অখিলেশ উট্‌ নিয়ে মজার মজার ছড়া লিখে ওর ক্লায়েন্টদের উপহার দেয় । সঙ্গে ইংলিশ অনুবাদও থাকে ।উটেদের প্রিয় খাদ্য কাঁটাগাছ ওরা নিজেরাও খায় । অবশ্যই রান্না করে । তবে অনেক পর্যটক উটের মাংস খেতে আগ্রহী । সেই ব্যাপারে আপত্তি আছে অখিলেশের ! উট্‌ ওর বন্ধু ও পেশায় যুক্ত এক মুক্ত পশু । তাকে কেটেকুটে ভোজ করানোর ঘোরতর বিরোধী অখিলেশ । কাজেই কখনও বা গ্রহণ নামে । উজ্জ্বল আলো তখন ক্ষীণ হয়ে যায় । বচসা না করলেও কিছু মানুষ পিছু হাটে ।

অখিলেশ ও সুজাতা বলে :: **আমরা উট্‌ ও উট্‌পাখিকে নীড়ে বেঁধেছি মানে তো এই নয় যে ওদের প্রাণ নেবার অধিকার আমাদের আছে ?**

ওরা যেমন আমাদের বিশ্বাস করে সেরকম আমরাও ওদের ফ্রিডম্‌ দিয়েছি । কাজেই ব্যবসাটা সত্যি আমরা একটু লো স্কেলেই চালাই আর রাতের অজস্র তারার মাঝে শুয়ে শুয়ে ক্যাম্পফায়ারে ডুব দিয়ে মূর্গি খাই ।

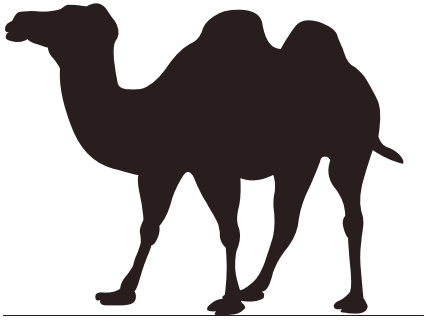

লোহিত কণিকা

নারীরা যখন সমুদ্রে নামে..... তখন তাদের পিরিয়ডের লাল রক্তের কারণে হাঙর তাদের আক্রমণ করে ও সাথে নিয়ে যায় আরো অনেককে ।

এই তথ্যের কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে কিনা তা জানতে সর্বহারা হয়েছে মহুয়া সিং ; চরণজিৎ সিং এর পত্নী ।

সমুদ্রে সার্ফ করতে গিয়ে, ওর একমাত্র পুত্র মাদল সিং নিহত হয়েছে হাঙরের কামড়ে । ডাঙায় তুলে আনলেও তাকে বাঁচানো যায়নি ।

এক নাবিক, বাজারে চালু করে যে নারীরা এরজন্য দায়ী । তারা ঋতুমতী হলেও জলে নামে আর আক্রান্ত হয় অন্যরা । রক্তের স্বাদ নিতে যেমন বাঘ পাগল সেরকম হাঙরও নাকি জলে বসে সেটা করে ।

যদিও নিজের একমাত্র পুত্রকে হারিয়েছে, হাঙরের কাছে তবুও একবিন্দু চিন্তা লেগে আছে মগজের এক কোণায় --দ্বন্দ , সত্য জানার আগ্রহ আর লজিক ।

মাতৃত্ব আর সত্যের মাঝে ফালাফালা হচ্ছে বিবাহসুত্রে শিখ হওয়া শিখ্‌নির চৈতন্য ।

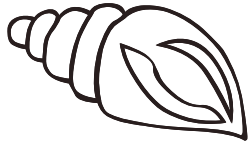

কোনারক্

কোনারক্ -কোনো ভগ্ন স্থাপত্য নয় , শিল্পরসের উৎসও নয়- এই কোনারক্ এক নতুন দেশে । এখানে মানুষ উজ্জ্বল রং এর আর তাদের শরীরের ওজন কম হলেও- স্নায়ুর ক্ষমতা অনেক বেশি । পেশী অনেক ফ্লেক্সিবেল্ । এরা লম্বা আর সরু । এই জিনের পরিবর্তন ঘটেছে ধীরে ধীরে । বেশ কয়েক প্রজন্ম ক্যান্সারের শিকার হয়েছে । নানা পরিবেশে খাপ্ খাওয়াতে গিয়ে জিনের বদল ঘটেছে । সেই ট্রান্সিশানের

জন্য , ক্যান্সারে পীড়িত মানুষের সংখ্যা বেড়েছে ওদের কমিউনিটিতে । জিনের এই গতিপ্রকৃতি যাদের নিঃস্ব করেছে তারাই আজ ওদের সমাজে পুষ্পস্তবক পাচ্ছে । পাচ্ছে বীরের শিরোপা । কারণ ওদের এই ত্যাগের কারণেই জিনের পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে আর মানুষ নতুন দিগন্তে পা রেখেছে ।

ক্যান্সারে আক্রান্ত মানুষকে এখানে কেউ একঘরে করেনা । ওদের সাদরে বরণ করে । ওরা আছে বা ছিলো বলেই আজ শুক্রগ্রহে পাড়ি দিয়েছে কোনারকের মানুষ । ভিনাসের মাটিতে পা দিয়েই বুঝেছে যে পৃথিবীর এনার্জি সমস্যার সমাধান শুক্র গ্রহের বুকেই আঁকা আছে । সেখান থেকে নতুন শক্তি আহরণে ব্যস্ত কোনারকের সমাজপতিরা ।

পার্থিব , দূর্লভ বস্তুকে অমরতা প্রদান করা আর মৃত ছায়াকে প্রাণ দান করার ক্ষমতা একমাত্র শুক্রাচার্যেরই যে আছে !

কলোনি কালচারে অভ্যস্থ সোনালি মানুষের কাছে হলেনই বা উনি লর্ড ভিনাস যিনি নিজে এক শিল্পী ও বাস্তবে সৌন্দর্য্যের প্রতীক ।

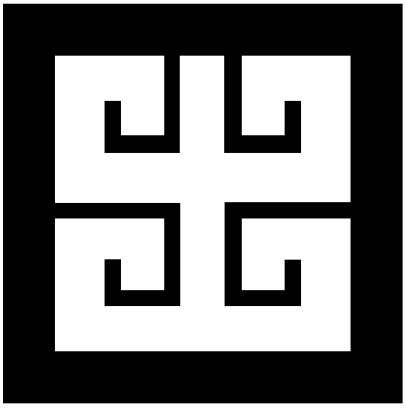

The end